যুগান্তর

তারিখ: 2 JUL 2004
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শান্তনু কায়সার

'ভালো' ফলাফল নাকি অশনি সংকেত?

গত ২৬ জুন এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর চারদিকে 'ভি' তথা বিজয় চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। দেখে আমার মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা এই— 'ভি' চিহ্ন কি তাদের প্রকৃত অর্জনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? যে পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে 'ভালো' ফলাফলের জন্য এত উল্লাস, সেই পরিসংখ্যানকে একটু বিচার করে দেখা যাক। এবার সবচেয়ে 'ভালো' ফলাফল করেছে মদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। তাদের পাসের হার গত বছরের চেয়ে ১৬ শতাংশের বেশি। একটি প্রতিবেদনে দেখতে পাচ্ছি, শতভাগ পাস বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ আর শূন্য ভাগ পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৪৮ থেকে কমে হয়েছে ৯১। অর্থাৎ তিনগুণের কম, কিন্তু আড়াই গুণের বেশি। অন্য প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সাতটি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার বেড়েছে ১৩.৪৪ শতাংশ, জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে ১৬ হাজারেরও বেশি। আরেকটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, একটি বোর্ডে এবার শূন্য পাসের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। রাসূল (সা.)-এর হাদিসে আছে, যদি তোমাকে কেউ বলে একটা পাহাড় তোমার দিকে হেঁটে আসছে তাও বিশ্বাস করতে পার, কিন্তু কারও চরিত্র রাতারাতি বদলে গেছে এটা বিশ্বাস কর না। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, কোন পরশ পাথরের স্পর্শে যেন হঠাৎ সবকিছু পাল্টে গেছে ও যাচ্ছে। এই গতি অব্যাহত থাকলে সারাদেশে অচিরেই সব প্রতিষ্ঠানেই শতভাগ পাস করবে। তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যদি দেখা যায়, বৌদ্ধিক বিকাশের বাস্তব পরিস্থিতি খুবই দুর্বল ও নাজুক, কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল 'অত্যন্ত ভালো' তাহলে সে ফলাফল নিয়ে আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ থাকবে কি? যুগান্তরের ২৮ জুনের প্রথম সম্পাদকীয়তে যে কথা বলা হয়েছে, 'ইংরেজি ও গণিত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও খাতা দেখিবার ক্ষেত্রে নাকি উদারতাও প্রদর্শন করা হইয়াছে' প্রকৃতই তা ঘটেছে। ওই সম্পাদকীয়তেই যে ঢাকার একটি 'নামি' স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'এইবারে প্রশাসনসহ বিভিন্ন দিক হইতে পাসের হার বাড়াইবার চেষ্টা ছিল' তাতে সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও প্রশ্ন ওঠে, এ ক্ষেত্রে প্রশাসন কেন চেষ্টা করবে? ব্যাপারটি কি বিচারককে প্রভাবিত অথবা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকেরই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো হয়ে যায় না? তাতে কি পরীক্ষা প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা ও শৃংখলাই ভেঙে পড়ে না?

বিষয়টির আরও ব্যাখ্যার আগে আরেকটি প্রতিবেদনের সাক্ষ্য নেয়া যাক। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এই ভালো ফলাফলের পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে কর্তৃপক্ষের কিছু উদ্যোগ-আয়োজন। বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং খাতা দেখার উদারতা প্রদর্শন, ন্যায্য নম্বর পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান এবং খারাপ ফলাফলের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা।' প্রতিবেদক জানিয়েছেন, গত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছিলেন, ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার ১০ শতাংশ করে বাড়লে সামগ্রিক পাসের হার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়বে।' 'সত্যি সত্যি' তাই হয়েছে। ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার ১০ শতাংশ করে বাড়ায় গত বছরের পাসের হার ৫৭.৩৭ থেকে ৭০.৮১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াচ্ছে? প্রতিবেদক লিখেছেন, 'এই বিশ্লেষণই এবার খেটে গেছে।'। খেটে গেছে নাকি খাটানো হয়েছে? 'ন্যায্য নম্বর' পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান আসলে একপাক্ষিক। খালি নম্বর বাড়িয়ে দেয়াই যদি ন্যায্যতা হয়, তাহলে তা অবশ্যই 'ন্যায্য' কিন্তু ন্যায্যতার অর্থ যদি হয় যার যা প্রাপ্য নির্মোহভাবে তাকে তা দেয়া, তাহলে একে অবশ্যই ন্যায্যতা বলা যায় না। আরি ত্বরি পারি যে কৌশলের মতো 'ন্যায্য' অর্থাৎ অধিকতর নম্বর দিয়ে যদি পাস ও অধিকতর 'ভালো' ফল করিয়ে দেয়াই লক্ষ্য হয়, তাহলে একদিন পুরো এই শিক্ষা ব্যবস্থাই ধসে পড়বে। জানতে খুব ইচ্ছে হয়, পরীক্ষকদের 'ভালো' ও বেশি নম্বর দেয়ার জন্য প্ররোচিত করা কতটা ভালো, নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ধরনের চালাকি করেই দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত করে বিদ্যালয়গুলো 'স্কুল এন্ড কলেজ' এবং সম্মান ও স্নাতকোত্তর 'পাঠদান' করে কলেজগুলো 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে প্রকৃতই কি উপযুক্ত মানের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, নাকি শিক্ষার্থীরা 'কেবলই 'ভালো' ফলাফল্ করছে তার সত্যিকার মূল্যায়নের কোন উদ্যোগ ও সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ইংরেজি ও গণিতে নিশ্চয়ই ভালো করা দরকার। কিন্তু ভালো করার প্রকৃত উদ্যোগ না নিয়ে যদি কেবল 'ভালো' করিয়ে দেয়াই লক্ষ্য হয়, তাহলে সে ভালো যে মন্দের চেয়েও খারাপ, সে কথা আমরা কবে বুঝব? শুধু ইংরেজি নয়, আমাদের বিবেচনা করা দরকার বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি এবং সে ক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে আমাদের মাতৃভাষার কথা। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবাই ইংরেজি নিয়ে যতটা 'ভাবেন' মাতৃভাষাকে ততটাই অবহেলা করেন। সেটা একটা হীনমন্য ও দাস মানসিকতা। ইংরেজি বলতে না পারার জন্য আমাদের যত দুঃখ, বাংলা না বলতে পারার জন্য আমাদের ততটাই স্বস্তি। কিন্তু খুব কম লোকই বুঝতে চান, নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশী কোন ভাষায় ন্যূনতমভাবেও দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইংরেজি শেখার নামে আমরা যে নকলনবিস করি তা মাকাল ফলের অন্তঃসারশূন্যতা। দেখতে 'সুন্দর' হলেও একে অকাজের ঢেঁকি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এসএসসি ও এইচএসসিতে ভাষাগত কোন দক্ষতা অর্জন না করেই যখন পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভাষা ও সাহিত্যের পত্রসমূহে ৯০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পাওয়া সম্ভব তখন তাকে প্রহসন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আর এই প্রহসনের ওপর নির্ভর করে আমরা যখন উল্লসিত হই, তখন আমাদেরই বা কি বলা যায়? গণিত যদি মস্তিষ্কের চর্চা না হয়ে কেবল প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীর 'উদারতা'য় কখন পড়ার ফাঁকিবাজি ও মানসিক আলসেমিতে পরিণত হয়, তাহলে ১০০-তে ১০০ পেয়েই কি লাভ? দুঃখজনক হচ্ছে বাবুমশাই অথবা ভদ্রলোককে সত্যি কথাটা বলার মতো মাঝির এদেশে খুবই অভাব, যিনি ষোল আনা ফাঁকির বিষয়ে স্পষ্ট ও ঋজু মন্তব্য এবং এ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। বহু বছর আগে পাকিস্তানি আমলে বাংলা একাডেমীর একুশে ফেব্রুয়ারির এক আলোচনা সভায় মুনীর চৌধুরী বাংলা ভাষা 'সহজীকরণে'র তথাকথিত তৎকালীন এক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, চীনা জনগণ যদি তাদের বর্ণমালার জটিলতা সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার বাড়াতে পারে, আমরা কেন পারব না? যেখানে যা ও যেভাবে শেখা আবশ্যক সেখানে তা সেভাবেই শিখতে হবে। একে সরল ও তরল করে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি আরও বলেছিলেন, যত জটিলই হোক, চিকিৎসককে অবশ্যই শরীর ও শরীর বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি করে আমরা কেবল মানবশত্রুই সৃষ্টি করব। লোভ ও প্রলোভন কখনও শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। তাকে জয় করে ও মোহমুক্ত হয়ে প্রকৃত অর্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও চালাকি কখনও পরস্পরের মিত্র হতে পারে না। কিন্তু আমরা যদি চালাকিকেই শিক্ষা বলে গণ্য করি, তাহলে ওই ফাঁকিবাজিও আর এক সময় একেবারেই কাজ করবে না। অতএব, আত্মপ্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়ার এটাই কি চূড়ান্ত সময় নয়?

শান্তনু কায়সার : *লেখক ও সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি কলেজ*